সাইয়েদ কুতুব শহীদ

আবদুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সাইয়েদ কুতুব শহীদ

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

প্রকাশনায়
উত্‌লু প্রকাশন
৪৯/১ সোনালীবাগ,এলিফ্যান্ট রোড
বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

উঠলেন। এক সুন্দরী রূপসী সুঠামদেহী নগ্নপ্রায় যুবতী তাঁর সামনে দন্ডায়মান। পুরো শরীরে রূপ যেন উপছে পড়ছে। সাইয়েদ কুতুবকে বললেন। জনাব, আমি কি আজ রাত আপনার রুমে আপনার মেহমান হতে পারি? সাইয়েদ কুতুব জবাব দিলেন, দুঃখিত। রুমে একটিই খাট। এক খাট একজনের জন্যই নির্ধারিত। যুবতী বলল, খাট এত প্রশস্ত এতে দুজনও থাকা যায়। যুবতী ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করল। সাইয়েদকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার নানা কৌশল প্রয়োগ করল। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে ভীত সাইয়েদের মন যুবতীর দিকে যায়নি। তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। মেয়েটি দীর্ঘক্ষণ দরজার বাইরে খটখট করে চলে গেল। প্রবৃত্তির উপর নৈতিকতার জয় হল।

জাহাজে আরেক ঘটনা ঘটল। একজন খ্রীস্টানকে মুসলমানদের মাঝে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করতে দেখে সাইয়েদের মাঝে ঈমানী চেতনা জাগ্রত হল। তিনি কাপ্তানের কাছে গেলেন। জাহাজে আরোহী সমস্ত মুসলমানের জুমার নামাজ আদায়ের সুযোগদানের জন্য আবেদন করলেন। কাপ্তান সম্মত হল। সাইয়েদ জুমার পূর্বে চমৎকার খুতবা দিলেন। নামাযে ইমামতি করলেন। আরোহীরা বিমোহিত চিত্তে তাকিয়ে রইল। যুগোস্লাভিয়ার জনৈকা খ্রীস্টান মহিলা কোরআন তেলাওয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন।

আমেরিকায় দুই বছর

সাইয়েদ দুই বছর আমেরিকায় অবস্থান করেন। সেখানে অনেক অনৈতিক ও অশালীন ঘটনা দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়য়া ছাত্র-ছাত্রীদের নগ্নতা দেখে ভাবলেন, তারা প্রবৃত্তির দাস হয়ে কতই না অধঃপতিত জীব যাপন করছে? হাসপাতালে রুগিনীও যৌন অত্যাচারের শিকার হ দেখলেন। সম মৈথুনে লিপ্ত হচ্ছে নর নারী । সাইয়েদকেও পদস্খ করতে চেষ্টার কমতি ছিলনা। আল্লাহর অসীম রহমতে তিনি ইসলা উপর অবিচল থাকতে পেরেছেন। সাইয়েদ আমেরিকা থাকার স পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি বীত শ্রদ্ধ হন। তিনি আগের তুলনায় ইসলামের অধিক অনুরাগী হন। দু'বছর পর আরেরিকা থেকে ফিরেই তিনি ইসল

www.bjilibrary.com

নতুন জীবন লাভ করেন। তাঁর নিকট দ্বীন ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়। ইসলাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিরাট নেয়ামত এবং আধুনিক জাহেলিয়াতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইসলামের কোন বিকল্প নেই একথা তিনি দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেন। মনে মনে ভাবলেন, অতীতে রঙীন স্বপ্ন ও নানা কল্পনা আমাকে প্রতারিত করেছে। তিনি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেন এবং কোরআনের ছায়াতলে জীবন যাপন শুরু করলেন। তারপর চাকুরী থেকে ইস্তেফা দানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ

সাইয়েদ কুতুব মন্ত্রণালয়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিকট প্রিয় ছিলেন। তাঁর অনুপম চারিত্রিক মাধুর্যে সবাই মুগ্ধ ছিল। আমেরিকা থাকার সময়ই সাইয়েদের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেন। ১৯৫২ সালের ১৮ ই মে ইস্তেফা পত্র জমা দেয়ার সময় শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন ইসমাঈল আলকাবানী। মন্ত্রী মহোদয় পূনরায় চাকুরীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুরোধ জানান। এক বছর পর্যন্ত তাঁর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করা হয়নি। মন্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতপার্থ্যক্য থাকার পরও মন্ত্রী তাঁকে খুবই সম্মান করতেন। কারণ তিনি সব সময় দেশের কল্যাণ নিয়ে চিন্তা করতেন। মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন কাজের মৌলিক পরিকল্পনা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন। তিনি চাকুরী জীবনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তুষ্টি বা পদোন্নতির জন্য লালায়িত ছিলেন না। যা সঠিক মনে করতেন তাই বলতেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনে যোগদান

সাইয়েদ কুতুব ১৯১৯ সালের জাতীয় আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৭ বছরের অধিক সময় হেযবুল ওয়াফদের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল। পরবর্তীতে উক্ত সংগঠন ত্যাগ করেন। তাঁর মতে আগামী দিনের সঠিক নেতৃত্বের জন্য নতুন বংশধরদের চরিত্র গঠন প্রয়োজন। এই জাতীয়

www.bjilibrary.com

আন্দোলনে চারিত্রিক সংশোধনের কর্মসূচী নেই। উক্ত সংগঠন ত্যাগের পর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও একাডেমিক ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রচেষ্টা চালান। ইখওয়ানে যোগদানের পূর্বপর্যন্ত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় দাওয়াত ও ইসলাহের কাজ করেন। ১৯৫২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগদেন। তিনি ১৯৫৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইখওয়ানে যোগদান করলেও আরও আগে থেকেই ইখওয়ান সম্পর্কে জানতেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর স্বাধীন মিসর চাই ইখওয়ানের এ শ্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। দুবছরে ইখওয়ানের কর্মী সংখ্যা ২৫ লাখে পৌঁছে। সমর্থক ও সহযোগীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে ষড়যন্ত্র ও নির্যাতন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ইখওয়ানের মুর্শিদে আম উস্তাদ হাসানুল বান্নাকে শহীদ করা হয়। ইখওয়ানুল মুসলীমীনকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। সাইয়েদ কুতুব সেই সময় আমেরিকায় ছিলেন। তিনি হাসানুল বান্নার শাহাদাতের খবর পত্রিকায় পড়ছেন। টপটপ করে অশ্রু ঝরেছে। চোখের পানিতে পত্রিকা ভিজে যায়। সাইয়েদ কুতুব দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারবাদী আন্দেলেন গড়ে তোলার জন্য একটি যুব সংগঠন করার চিন্তা করছিলেন, তাঁর স্বপ্নের বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পেলেন ইখওয়ানুল মুসলীমীনের মধ্যে। ১৯৪৯ সালেই তিনি তাঁর লিখিত আল আদালাতুল ইজতিমাইয়াতু ফীল ইসলাম বইটি উপহার দেন সে সব যুবকদের উদ্দেশ্যে যারা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত। এ নযরানার মাধ্যমে ইখওয়ানের প্রতি তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে হাসানুল বান্নার সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়েছে কিনা এটার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, তিনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসেই ইখওয়ানের ফরম পূরণ করেন। ১৯৫৩ সালে সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তেফা দেয়ার আগ পর্যন্ত সরকারী কাজ আনজাম দিয়ে গোপনে ইখওয়ানের কাজে সময় দিতেন।

ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাইয়েদ ঃ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব

সাইয়েদ ইখওয়ানের একজন সাধারণ সদস্য। তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইখওয়ানের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লেখনী বক্তৃতা নেতৃত্ব

www.bjilibrary.com

সকল ক্ষেত্রেই তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়াতী কার্যক্রম বিভাগের ইনচার্জের দায়িত্ব পান। ১৯৫৩ সালে দামেস্ক সফর করেন। সেখানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন। সাইয়েদ কুতুব দুই ঘন্টা বক্তৃতা রাখেন। বক্তৃতায় তিনি কোরআনের সৌন্দর্য, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হন।

আশ্চর্যের বিষয়, তিনি লিখিত কোন নোট ছাড়াই তথ্য বহুল দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। এরপর তিনি আরেক কনফারেন্সে বায়তুল মোকাদ্দাস যান। সেখান থেকে জর্দান সফর করেন। আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়ের সময় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক গঠনমূলক চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাইয়েদের ভূমিকায় ইখওয়ানের মুর্শিদ-ই-আম ওস্তাদ ডঃ হাসান হুদাইবী মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মনোনীত করেন। সে সময় ইখওয়ানের পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সাইয়েদ কুতুবকে পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি দক্ষতার সাথে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

সাইয়েদ কুতুবের প্রথম কারাবরণ

১৯৪৫ সালে জামাল আব্দুন নাসের ও ইংরেজদের মধ্যে চুক্তি হয়। ইখওয়ান 'ইঙ্গ মিসর' চুক্তির বিরোধিতা করে। ফলে ইখওয়ান কর্মীদের উপর চালানো হয় দমন, পীড়ন, নির্যাতন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার নেতা-কর্মীকে কারাবন্দী করা হয়। এর মধ্যে ছয়জন কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। সে সময় তিনি ছিলেন জ্বরে আক্রান্ত। তিনি অসুস্থতায় বিছানায় কাতরাচ্ছিলেন। একজন সামরিক অফিসার ঘরে ঢুকলেন। তার সাথে রয়েছে অনেক সশস্ত্র সিপাহী। তারা রোগ শয্যায় শায়িত সাইয়েদ কুতুবের হাতে Hand Cup পরিয়ে দিলেন। তাকে কারাগারের দিকে নিয়ে চললেন। তাঁকে কোন গাড়িতে না চড়িয়ে পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য করা হল। অত্যধিক অসুস্থতায় রাস্তায় চলার পথে

www.bjilibrary.com

তিনি বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হুঁশ ফিরে এলে মুখে উচ্চারিত হত ইখওয়ানের প্রিয় শ্লোগান 'আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।'

তাকে সামরিক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। কারাগারের ভিতর প্রবেশের সাথে সাথে হিংস্র হায়েনার দল তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুঘন্টা যাবৎ জেলের অন্ধকার রুমে অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। তাঁর প্রতি এক ভয়ংকর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরটি সাইয়েদ কুতুবের পায়ে কামড় দিয়ে টেনে হেঁচড়ে এদিক সেদিক নিয়ে যায়। এর পর তাঁকে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাইয়েদ কুতুব নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। এমন অবস্থার পরও তাকে রিমান্ডে নিয়ে একের পর এক বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। দীর্ঘ সাত ঘন্টা যাবৎ প্রশ্ন পর্বের মাধ্যমে মানসিক নির্যাতন করা হয়।

সাইয়েদ কুতুব শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়লেও মানসিকভাবে ছিলেন খুবই সবল। ঈমানী বলে তিনি ছিলেন বলীয়ান। কখনই নির্যাতনের সীমা বৃদ্ধি পেলে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেন 'আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লিহিল হামদ।' রাতে তাকে একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রাখা হত। সকাল বেলা খালি পায়ে প্যারেড করতে বাধ্য করা হত। এভাবে অমানুসিক নির্যাতনে তার বুকের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথাসহ সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা বেদনার সৃষ্টি হয়।

তিনি নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হন। যার ফলে ১৯৫৫ সালের ২রা মে তাকে সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়।

সাইয়েদ কুতুবের শিষ্য ইউসুফ আল আযম লিখেন, 'সাইয়েদ কুতুবের ওপর বর্ণনাতীত নির্যাতন চালানো হয়। আগুন দ্বারা সারা শরীর ঝলসে দেওয়া হয়। পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান রক্তাক্ত করা হয়। মাথার ওপর কখনো উত্তপ্ত গরম পানি ঢালা হত। পরক্ষণেই আবার খুবই শীতল পানি ঢেলে শরীর বরফের ন্যায় ঠান্ডা করা হত। পুলিশ লাথি, ঘুষি মেরে একদিক থেকে অন্য দিকে নিয়ে যেত।

www.bjilibrary.com

সাইয়েদ কুতুবের ১৫ বছরের কারাদন্ড ঃ মন্ত্রীত্বের টোপ

১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে সাইয়েদ কুতুবকে ১৫ বছর কারাদণ্ডের আদেশ শুনানো হয়। সে সময় তিনি এত বেশী অসুস্থ ছিলেন যে, সে আদেশটি শোনার জন্য তার পক্ষে আদালতের কাঠগড়ায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।

১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি পেটের পীড়ায় ভোগেন। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে সাইয়েদ কুতুব মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারাগারের ভিতর তাঁর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করা হলো না। বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠল তাঁকে কারাগারের বাইরে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু কোন ফল হল না। ৬ মাস পর আলমানিল হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু তার ৬ মাস পর পুনরায় তাঁকে কারা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সাইয়েদ কুতুবের এই অসুস্থতার পিছনে নির্যাতনই প্রধান কারণ ছিল। এমনও হয়েছে একাধারে ৪দিন একই চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে। খানা পিনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর সামনে অন্যরা পানি পান করত অথচ তাঁকে এক গ্লাস পানি দেওয়া হত না। আশ্চর্যের বিষয়, সাইয়েদ কুতুবের ওপর শারিরীক শত নির্যাতন সত্ত্বেও দাওয়াত জিহাদ ও আন্দোলনের কাজ থেকে তাঁকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি সময় পেলেই জেলে দাওয়াতী কাজ করতেন। ইখওয়ানুল মুসলিমীন নিয়ে ভাবতেন ও বিভিন্ন পরিকল্পনা করতেন। তিনি ঈমানী চেতনায় এত বেশী উদ্দীপ্ত ছিলেন যে, কোন সময়ই অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে চাননি। কারাগারে আসার ১বছর পরই সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, যদি আপনি ক্ষমা চেয়ে কয়েকটি লাইন লিখে দেন, যা বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে, তাহলে আপনাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আপনি জেলের কষ্টকর জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ঘরে আরামে থাকতে পারবেন। এ প্রস্তাব শুনে সাইয়েদ জবাব দিলেন, আমার অবাক লাগে এ সকল লোকেরা মজলুমকে বলছে জালিমের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে। আল্লাহর শপথ, যদি কয়েকটি শব্দের উচ্চারণের ফলে আমাকে ফাঁসীর মঞ্চ থেকে নাজাত দেয়

www.bjilibrary.com

তবুও আমি তা বলতে প্রস্তুত নই। আমি আমার রবের দরবারে এমনভাবে হাজির হতে চাই যে, আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট আর তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট। জেলখানায় যখনই তাকে ক্ষমা চাইতে বলা হত, তিনি বলতেন, যদি আমাকে কারাবন্দী করা সঠিক হয়, তাহলে আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর যদি অন্যায় ভাবে আমাকে কারাগারে আটক রাখা হয়, তাহলে আমি জালিমের কাছে করুণা ভিক্ষা চাইতে রাজী নই।

এরপর সরকারের পক্ষ থেকে টোপ দেয়া হয়, তিনি যদি সম্মত হন তাহলে তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হবে। সাইয়েদ এ প্রস্তাব শুনে প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'আমি দুঃখিত। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সে সময় পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না মিসরের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার এখতিয়ার দেয়া না হবে।' সাইয়েদ তাঁর বিশ্বাসে অটল রইলেন। জালিম শাসকের সাথে আপোষ করেননি।

তাররা কারাগারে রক্তের স্রোত

সাইয়েদ কুতুব 'তাররা' কারাগারে থাকতেন। সেখানে ইখওয়ানের আরও ১৮৩ জন কর্মী ছিল। তাদের সাথে পরিবার পরিজনকেও দেখা করতে দেয়া হত না। একবার আব্দুল্লাহ মাহের ও আব্দুল গাফফার নামক দুজন ইখওয়ান কর্মীকে তাদের আত্মীয় স্বজন দেখতে আসেন। কিন্তু তাদের সাথে আত্মীয়দের সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়নি বরং তাদের দেখতে আসার শাস্তিস্বরূপ কারাগারে আটক রাখা হয়। কারাবন্দী ইখওয়ান কর্মীরা এ অমানবিক ঘটনার প্রতিকার চেয়ে কারা তত্ত্বাবধায়কের নিকট আবেদন জানান। কিন্তু ফল হল উল্টো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে কারাগারে অস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যরা প্রবেশ করে। সৈন্যরা অগ্নি গোলা বর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাস্থলেই ২১জন ইখওয়ান কর্মী শাহাদাত বরণ করেন। ২৩ জন মারাত্মক আহত হন। রক্তে রঞ্জিত হয় তাররা কারাগার। এ ঘটনার পর মন্ত্রী পরিষদের সচিব সালাহ দাসুকী তদন্তে আসেন। তদন্তে কি হয় এ ভয়ে

www.bjilibrary.com

সকলেই তটস্থ হয়ে পড়ে। না, যাদের গুলিতে রক্তের স্রোত বইছে তাদের কিছুই হয়নি। ইখওয়ান কর্মীদের উপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন সচিব মহোদয়।

কারাগারের বিচারপতি অসুস্থ ঃ খাদেম কারাসঙ্গী সকলেই

আল্লাহ সাইয়েদ কুতুবকে এক বিরাট যাদুকরী সম্মোহনী শক্তি দিয়েছিলেন। কারাগারের সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত, সম্মান করত। তাঁর কাছে সকল কথা খুলে বলত। কারাগারের বিভিন্ন বিষয় তিনি মীমাংসা করতেন। হাজতী, কয়েদীদের পরস্পরে ঝগড়া হলে তিনি বিচার করতেন। তাই তাঁকে উপাধি দেয়া হয় কাজী উস সিজন (কারাগারের বিচারপতি)। যখন কোন কয়েদীকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা হত তিনি তাকে বিদায় দিতেন। তাঁকে খাবারের কোন কিছু দেয়া হলে তা অন্যদের মাঝে বিতরণ করতেন। জেলসুপার, জেলডাক্তার সবাই তাঁকে ভালবাসত। তিনি কারাবন্দীদের খোঁজ খবর রাখতেন। এমনকি কারাগারে যেসব প্রাণী থাকত, তিনি তাদেরও যত্ন নিতেন, খাবার দিতেন। তিনি তাঁর আচরণে সবার মন জয় করেন।

একবার তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে দীর্ঘদিন ছিলেন। কারাসঙ্গী অন্যরা তাঁর খেদমত করতেন। তিনি হাসপাতাল আঙ্গিনায় অন্যদের সাথে খোশ-গল্প করতেন। তিনি ছিলেন খুবই ধৈর্য্যশীল। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দ পরামর্শের জন্য কারাগারে গেলে স্বাভাবিকভাবেই পরামর্শ দিতেন। কখনও কখনও ছোট বোন হামিদা কুতুবের মাধ্যমে পরামর্শ পাঠাতেন। সাইয়েদের কারা জীবনে মানসিকতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। একবার আদালতের কাঠগড়ায় তিনি দাঁড়ানো। তাঁর ভাই-বোনেরা দেখতে তাঁকে এসেছেন। সবাইকে দেখে তিনি মুচকি হাসলেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং ধৈর্য্যের উপদেশ দিলেন।

কারাগারেই তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন লেখা সমাপ্ত করেন

কারাগার খুবই কষ্টকর জায়গা। বিশেষত যাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালানো হয় তাদের তকলিফের সীমা থাকে না। সাইয়েদ কুতুব কারাগারে

www.bjilibrary.com

বর্ণনাতীত নির্যাতনের সম্মুখীন হন। কিন্তু এ মহান চিন্তা নায়কের কলম কারাগারেও সচল ছিল। কারাগারে বসেই অনেক বই লেখেন। মায়ালেমু ফিততারিক (ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা নামে বংলায় অনুবাদ হয়), কিতাবু হাযাদদ্বীন, আল মুসতাকবিল লিহাযাদদীন, আল ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাজারাহ, খাসায়েসু ছুয়ারিন ইসলাম, মুকাওয়ামমাতু তাসাব্বুরিল ইসলাম প্রভৃতি গ্রন্থ কারাগারেই রচনা করেন। তবে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন। এ তাফসীরটি ১৯৫৪ সালে কারাগারে যাওয়ার পূর্বে লেখা শুরু করেন। আর কারাগারের ভিতরই লেখা সমাপ্ত হয়। সাইয়েদ সব সময় কুরআন নিয়ে ভেবেছেন। চিন্তা করেছেন। কুরআনের সুরাসমূহ নিয়ে হৃদয়ে ছবি এঁকেছেন।

তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন তাফসীরের সাহায্যে কুরআন বুঝার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোথাও কুরআনের স্বাদ, কুরআনের সৌন্দর্য, শৈশবের কুরআন তেলাওয়াতের মিষ্টি মধুর আনন্দ অনুভব করলেন না। তাই তিনি তাফসীরের সাহায্যে কুরআন বুঝার বদলে কুরআনকে কুরআন দিয়েই বুঝার চেষ্টা করেন। এবার কুরআনের প্রাণস্পর্শী আবেদন তাঁর হৃদয়ে নাড়া দিল। কুরআনের সাথে ভালবাসা সৃষ্টি হল। কুরআনের কথা গুলো মানুষের জীবনের সাথে মিলিয়ে তিনি মর্মোদ্ধারের প্রয়াস চালালেন। ১৯৩৯ সালে আল মুকতাতাফ ম্যাগাজিনে 'আত তাসবিরুল ফান্নী ফিল কুরআন' শিরোনামে কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। তিনি বর্তমান সমাজ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। তিনি দেখলেন বস্তুগত দর্শন মানুষকে মুক্তি দিতে পারছে না। আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে গিয়ে মানব রচিত চিন্তা ও দর্শনের আলোকে সমাজ পরিচালিত হওয়ায় সমাজে এত দুঃখ দুর্দশা। মূলত, কুরআনের আলোকে যে সমাজ পরিচালিত হয় না, তা জাহেলী সমাজ। এ সমাজ মানুষকে শান্তি ও মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারে না। আধুনিক জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত মানবতার মুক্তি পেতে হলে কুরআনের ছায়াতলেই জীবন যাপন করতে হবে। সাইয়েদ কুতুব তাঁর তাফসীর ফী যিলালিল কুরআনে এ কথাই তুলে ধরেছেন। ১৯৫২ সালে 'আল মুসলীমুন' পত্রিকায় ফী যিলালিল কুরআন (কুরআনের ছায়াতলে) শিরোনামে লেখা শুরু করেন। ফেব্রুয়ারী মাসে

www.bjilibrary.com

প্রথম লেখা ছাপা হয়। সুরা বাকারার ১০৩ নং আয়াত পর্যন্ত প্রথম স্তরে লেখেন। এরপর কিছুদিন লেখা বন্ধ থাকে। ৫২ সালের অক্টোবর মাস থেকে পুনরায় লেখা শুরু করেন। ৫৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ষোল পারা ছাপা হয়। ১৯৫৪ সালে তাঁকে কারাগারে নেয়া হয়। সরকার কারাগারে লেখালেখিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কারাগারে কাগজ কলম ছিল না। কারো কাছে এটি পাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু সাইয়েদ পেরেশান ছিলেন তাফসীর লেখার জন্য। তিনি তাফসীর প্রকাশের জন্য একজন প্রকাশকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন। প্রকাশক নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলে আদালত লেখালেখির অনুমতি দেন। সাইয়েদের তাফসীর লেখার কাজ পুনরায় শুরু হয়। সরকারের পক্ষ থেকে শেখ মোহাম্মদ গাজালীকে ফী যিলালিল কুরআনের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। তিনি দেখে দেয়ার পর তা ছাপা হত। সাইয়েদ কুতুব কারাগারেই ফী যিলালিল কুরআন সমাপ্ত করেন। ১৯৬৪ সালে মুক্তি পাওয়ার পর নতুন আঙ্গিকে কুরআনের তত্ত্ব ও মহত্ব উদঘাটনের চেষ্টা করেন। এ দৃষ্টি ভঙ্গীতেই শেষ তিন পারা, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পারা লেখেন। আশা করেছিলেন এভাবে সাতাশ পারা পর্যন্ত লিখবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা পুরণ হল না। ১৯৬৫ সালে তাঁকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয়া হয়।

তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন সাইয়েদ কুতুবের অমর সৃষ্টি। নতুন আঙ্গিকে এ তাফসীরটি লিখিত। তিনি এক নজরে সম্পূর্ণ সূরার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। অতপর আয়াতগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। এ তাফসীরটি ফিকহী দ্বন্দ্ব মুক্ত। কুরআন মজীদ আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়ার যে টেকনিক পেশ করেছে সে দৃষ্টিতে এটি দাওয়াত ইলাল্লাহর জন্য উত্তম তাফসীর। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে এ তাফসীরে। এদিক থেকে এটি বৈজ্ঞানিক তাফসীর। সাইয়েদ কুতুব একজন অন্যতম সেরা সাহিত্যিক। তিনি সাহিত্যিক হিসাবেই এ তাফসীরের বাক্য বিন্যাস, শব্দ চয়ন ও উপাস্থাপনা করেছেন। আধুনিক জাহেলিয়াত থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ইসলামের বিজয় পতাকা উডডীন করতে তিনি ছিলেন অগ্র সেনানী। তাই তাঁর তাফসীর পড়ে জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জযবা পয়দা হয়।

www.bjilibrary.com

কারাগার থেকে মুক্তি ঃ ভিত্তিহীন অপপ্রচার

সাইয়েদ কুতুব ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। প্রথম তিন বছর চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হন। আত্মীয় স্বজনদেরকেও দেখা করতে দেয়া হত না। পরবর্তীতে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়। লেখালেখির সুযোগ দেয়া হয়। তাঁকে পনের বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। ১৯৬৪ সালে ইরাকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফ কায়রো সফর করেন। ইরাকের আলেমদের আবেদনে ইরাকী প্রেসিডেন্ট মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরের সাথে বৈঠককালে সাইয়েদ কুতুবকে মুক্তি দেয়ার অনুরোধ জানান। ইরাকের প্রেসিডেন্টের সাথে নাসেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নাসের এই ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি করতে আগ্রহী ছিলেন। তাই সাইয়েদকে মুক্তি দেন। মুক্তির পর কারাগারের উপকণ্ঠে অবস্থানকালে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন কড়া দৃষ্টি রাখে, কারণ কারা কারা সাইয়েদের সাথে দেখা করতে আসে তা জানার জন্যে। সে সময় সাইয়েদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলের নেতৃবৃন্দ তাঁর কাছে ছুটে আসতেন।

জেল থেকে মুক্তির পর সাইয়েদকে ঘিরে এক মজার অপপ্রচার শুরু হয়। ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা হয়, 'সাইয়েদ কুতুব ইসলামের কথা বলেন অথচ তাঁর জীবনে ইসলাম নেই। সাইয়েদ কুতুব জেল থেকে মুক্তি পাবার পর কায়রোর পথ দিয়ে যাবার সময় তাঁর সাথে ছিল তাঁর স্ত্রী ও বড় মেয়ে। তাঁরা উভয়ে ছিল নগ্ন প্রায়। তাঁদের মাথায় স্কার্ফ পর্যন্ত ছিল না।' এ ধরনের ভিত্তিহীন অপপ্রচারের সম্মুখীন হন সাইয়েদ কুতুব। অথচ তিনি তখন বিয়েই করেননি। তিনি জীবনে দুবার বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি যখন গ্রামে ছিলেন তখন দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ার সাথে বিয়ের কথা হয়। কিন্তু তিনি যখন গ্রাম থেকে কায়রোতে চলে যান তখন সে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। মন্ত্রণালয়ে চাকরী পাবার পর গ্রামের সেই মেয়েটির অনুরূপ আরেকটি মেয়ের সাথে বিয়ের কথা হয়। কিন্তু মেয়ের বয়স কম হওয়ায় পরে বিয়ে দেয়া হবে বলে মেয়ের পরিবার জানায়।

www.bjilibrary.com

এরপর তিনি আমেরিকা চলে যান। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ব্যস্ত জীবন কাটান। ঐ মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে যায়। কিছুদিন পর আবার বিয়ের চিন্তা করেন। একখানে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন ভাবছিলেন। কিন্তু বিয়ের পূর্বেই তিনি আবার ৫৪ সালে গ্রেফতার হন। ১৯৬৪ সালে কারামুক্তির পর আবার বিয়ের কথা চিন্তা করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয় ৫৯ বছর। কিন্তু ৬৫ সালে পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৯৬৬ সালে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এভাবেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। জীবনে তিনি কোন নারীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হননি। তবুও এ ভিত্তিহীন অপপ্রচারের শিকার হন তিনি।

দ্বিতীয়বার সাইয়েদ কুতুবকে গ্রেফতার

সাইয়েদ কুতুব জেল থেকে মুক্তির পর কায়রোতে নিযুক্ত ইরাকী রাষ্ট্রদূত তাঁর সাথে দেখা করেন। সাক্ষাতকালে তিনি সাইয়েদকে ইরাকে সম্মানজনক চাকুরীর প্রস্তাব দেন। সাইয়েদ প্রতিউত্তরে বলেন, 'আমি মিসরের অধিবাসী। মিসরেই আমি জন্মেছি। দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমি দেশেই অবস্থান করবো। আমি দুঃখিত এ জন্য যে, আপনার প্রস্তাবিত পদ গ্রহণ করতে পারছি না।'

সাইয়েদ দেশের বাইরে গেলেন না। দেশের প্রতি তাঁর দরদ ছিল, মমতা ছিল বলেই। কিন্তু দেশের সরকার অজুহাত খুঁজছেন কিভাবে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা যায়। এ জন্য একটি নাটক সাজানো হলো, এক গোয়েন্দা পুলিশ পকেটে ইখওয়ানের সদস্য হওয়ার ফরম রেখে জামাল আব্দুন নাসেরের জনসভায় যায়। সভার কাজ শুরু হলে সে নাসেরকে লক্ষ্য করে পর পর ১২ রাউন্ড গুলী ছুঁড়ে। কিন্তু একটি গুলীও কারো গায়ে লাগেনি এবং যে ব্যক্তি গুলী ছুঁড়েছে সেও পালাবার কোন চেষ্টা করেনি। পুলিশ গ্রেফতার করে ঐ ব্যক্তিকে নাসেরের সামনে নিয়ে গেলো। নাসের বলল। তার পকেট তল্লাশী করে দেখো ইখওয়ানের কোন কাগজ আছে কিনা? তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলতে শুরু করল। হ্যাঁ, আমি ইখওয়ানের

www.bjilibrary.com

লোক। প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার জন্য ইখওয়ান আমাকে পাঠিয়েছে। সাথে সাথে পুলিশের লোকেরাও চিৎকার করে উঠল, স্যার, এই যে দেখুন ইখওয়ানের সদস্য ফরম তার পকেটে। নাসের তো এই অজুহাতটির খোঁজেই ছিল। সাথে সাথে শুরু হল গণ গ্রেফতারী। মিসরের প্রেসিডেন্ট ইখওয়ান কর্মীদের বিচারের জন্য স্পেশাল সামরিক আদালত বসালেন। এক অধ্যাদেশ জারী করে গণ গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করার সুযোগ রহিত করেন। সাইয়েদ কুতুবকে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আখ্যায়িত করে ইখওয়াঁনকে তার পদাংকানুসারী বলে প্রচারণা চালিয়ে ঘায়েল করার চেষ্টা করেন। সে সময় চল্লিশ হাজারের বেশী নেতা কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সাইয়েদ কুতুব দ্বিতীয়বার গ্রেফতার হলেন। এবার গ্রেফতারী পরওয়ানা দেখে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে আমি জানি জালিমরা এবার আমার মাথাই চায়। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। নিজের মৃত্যুর জন্য আমার কোন আক্ষেপ নেই। আমার তো বরং সৌভাগ্য যে, আল্লাহর রাস্তায় আমার জীবনের সমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আগামী কালের ইতিহাসই এটা প্রমাণ করবে যে ইখওয়ানুল মুসলীমীন সঠিক পথের আনুসারী ছিল, নাকি এই জালিম শাসক গোষ্ঠী সঠিক পথে ছিল?

গ্রেফতারকৃতদের মাঝে সাইয়েদা জয়নাব আল গাযালীও ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ষাট বছরের বেশী। তিনি ছিলেন মহিলা সংগঠনের নেত্রী। তাঁকে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। হাসান হোযাইবী, তার ছেলে মামুন আল হোযাইবী ইসমাইল, তার মেয়ে সাইয়েদা খালেদা, স্ত্রী ও পুত্র বধুকেও কারাগারে আটক করা হয়। কারাবন্দী নারী পুরুষের উপর চালানো হয় অমানুসিক নির্যাতন। একজন মহিলা যিনি দ্বীন প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর ভাই ও তাঁকে জেলে আনা হয়। ভাইকে বলা হয়, তুমি লেখো আমার বোন দুশ্চরিত্রা মহিলা এবং দেহ ব্যাবসায়। তিনি এ কথা লিখতে অস্বীকার করায় তার উপর পাশবিক নির্যাতন চালান হয়। বোন তাকে আবেদন জানায়, 'ভাইয়া, আপনি এ কথা লিখে দিন এবং শাস্তির হাত থেকে জীবন রক্ষা করুন।' ভাই বোনকে বললেন, 'বোন, তুমি আমার জন্য

www.bjilibrary.com

উত্তম আদর্শ এবং আমিও তোমার জন্য আদর্শ হয়ে থাকবো।' এরপর ভাই নির্যাতনে শাহাদাত বরণ করেন।

শাওকী আব্দুল আযীয নামক একজন ইখওয়ান কর্মীকে রমযানের দিন সম্পূর্ণ নগ্নদেহে ছাদে লটকানো হয়। তারপর ফোটা ফোটা পেট্রোল তার মাথায় ঢালা হয়। তখন তার দম বন্ধ হয়ে আসত। প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা এ শাস্তি চলত। জেল দারোগা কটাক্ষ করে তাকে জিজ্ঞেস করত তুমি কি এখনও পাক্কা মোমেন রয়েছো? তিনি জবাব দিতেন, 'হে আল্লাহ তুমি যদি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তাহলে এ শাস্তিকে আমি পরওয়া করি না।' একথা শোনার পর তাকে আরও চাবুক মারা হত। গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরা হত। মহিলাদের কাঠের সাথে বেঁধে অর্ধনগ্ন করে নির্যাতন করা হত। রক্ত ও পূঁজে তাদের শরীর ভরে যেত। পুরুষদের কাপড় খুলে শিশুর মত উলঙ্গ করে হাত কাধ পর্যন্ত উচু করে রাখতে বাধ্য করা হত। লোহার শিকলের সাথে বেঁধে হিংস্র কুকুর ছেড়ে দিত। অনেককে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করত। ভায়ের সামনে বোনকে বিবস্ত্র করা, অবিরাম ক্ষুধার্ত রাখা, বৈদ্যুতিক শক দেয়া, ঘুমাতে না দেয়া এসব ছিল শাস্তিদানের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোনদের কারাবরণ

সাইয়েদের ছোট ভাই মোহাম্মদ কুতুব। ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে গ্রেফতার করে কোথায় রাখা হয়েছে তা কেউ জানত না। তাকে এত বেশী অত্যাচার করা হয় যে তাঁর দিকে তাকালে তাঁকে চেনাই যেত না। তিনি ইখওয়ানের নেতা ছিলেন না। তিনি লিখতেন। তাঁর লেখনিতে ইখওয়ান কর্মীরা উদ্দীপ্ত হত। এটাই ছিল তাঁর অপরাধ।

সাইয়েদের পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন হামিদা কুতুব। ছোট বেলা থেকে সাহিত্য চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি করারুদ্ধ ইখওয়ান নেতা কর্মীদের সেবা যত্ন করতেন। সাইয়েদ কুতুবের বাণী

সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছাতেন। তিনিও বর্ণনাতীত নির্যাতনের শিকার হন। তাঁকে দশ বছর করাদন্ড দেয়া হয়। ছয় বছর চার মাস কারাবরণের পর তিনি মুক্তি পান। ড. হামুদী মাসউদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বর্তমানে তাঁরা ফ্রান্সে বসবাস করছেন।

সাইয়েদের আরেক বোন আমিনা কুতুব। তিনি উচ্চশিক্ষিতা এক মহিলা। দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে আপন ভাইদের সাথে শরীক ছিলেন। সমাজ সংস্কারে তিনি অনেক লেখালেখি করেন। তিনিও অনেক নির্যাতন ভোগ করেন। দীর্ঘদিন কারাগারে অন্তরীণ থাকেন। কারাগারেই ১৯৫৪ সালে কামাল ছানানী নামক জনৈক ইখওয়ান কর্মীর সাথে দেখা হয়। সেখানে থেকেই প্রণয়ের প্রস্তাব। কারা মুক্তির পর উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৮১ সালে আনোয়ার সাদাত হাজার হাজার ইখওয়ার কর্মীকে গ্রেফতার করে। কামাল ছানানীও গ্রেফতার হন। কারাগারে পাশবিক নির্যাতনে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

সাইয়েদ কুতুবের আরেক বোন যার নাম খুবই কম শোনা যায়। তিনি হচ্ছে নাফীসা কুতুব। তাঁকেও অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর বড় ছেলের নাম রিফাত। সে প্রাকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তাকেও গ্রেফতার করা হয়। মামার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে নির্যাতন করা হয়। কিন্তু তিনি রাজী হননি। নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। কারার চার দেয়ালের ভিতরই তিনি শহীদ হন। সাইয়েদের অপর ভাগিনার নাম আযম। সে মেডিকেলের ছাত্র ছিল। তাকেও কারাগারে অন্তরীণ করা হয়।

সাইয়েদ কুতুবের ভাই-বোন সকলেই কারা নির্যাতনের সম্মুখীন হন। ধৈর্য্যের সাথে তাঁরা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সাইয়েদ কুতুবকে জিজ্ঞাসাবাদ

সাইয়েদ কুতুবকে গোয়েন্দা বিভাগের তদন্ত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৬৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬.১০মিনিট থেকে রাত ১০.৩০মিনিট পর্যন্ত এবং পরের দিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ১২টা

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ২১শে ডিসেম্বর দুপুর ১টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ চলে। সাইয়েদ কুতুবকে জিজ্ঞাসাবাদে যে সব প্রশ্ন করা হয় তিনি বলিষ্ঠতার সাথে স্পষ্ট ভাষায় সে সব প্রশ্নের জবাব দেন।

প্রশ্নঃ আপনার নাম, ঠিকানা, পেশা ও বয়স বলুন।

জবাবঃ নাম সাইয়েদ, পিতা ইব্রাহীম। উসউত জেলার মুশা গ্রামে জন্ম। বর্তমানে হালওয়ানের ৪৪ হায়দার রোডে বাস করছি। পেশায় একজন লেখক, বয়স ৬০।

প্রশ্নঃ আপনি কি কারাগারের ভিতরে লেখালেখি করছেন?

জাবাবঃ হ্যাঁ, আমি আমার আকিদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা তুলে ধরে কিছু বই লিখেছি। ইসলামী জীবন দর্শন নিয়ে লিখেছি।

প্রশ্নঃ এ সম্পর্কে হাসান হুদাইবী কি অবগত আছেন?

জবাবঃ আমার ধারণা তিনি অবহিত আছেন।

প্রশ্নঃ এর আগে কারাগার থেকে বের হবার পর আপনি কি হাসান হুদাইবীর মুখোমুখি হয়েছেন?

জবাবঃ হ্যাঁ, আমার ঘরে তাঁর সাথে তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি এবং আমি ছাড়া তখন কেউ উপস্থিত ছিল না।

প্রশ্নঃ আপনাদের সংগঠনের অর্থ বিদেশ থেকে অর্থাৎ সৌদি আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে আসে তাই না?

জবাবঃ হ্যাঁ, আমাদের আকীদা ও চিন্তাধারায় যারা বিশ্বাসী পৃথিবীর যে কোন দেশেই থাকুক না কেন তাঁরা আমাদের ভাই। তাঁদের সাথে আমাদের আত্মীক সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু কোন দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ আপনি যে সম্পর্কের কথা বলেছেন তা ইখওয়ানের সাংগঠনিক দৃষ্টিতে, ইসলামের দৃষ্টিতে নয়, তাই না?

জবাবঃ ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গীই ইখওয়ান গ্রহণ করেছে।

প্রশ্নঃ আপনার দৃষ্টিতে যে সব মুসলিম ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত এবং যারা সম্পৃক্ত নয় তাদের মাঝে পার্থক্য কি?

জবাবঃ ইসলাম বাস্তবায়নে ইখওয়ান কর্মীদের কাছে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী

www.bjilibrary.com

রয়েছে। আর অন্যদের নেই। আমার দৃষ্টিতে তারাই উত্তম, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে।

প্রশ্নঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন যারা ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত তারা ফি সাবিলিল্লাহর কাজ করছে?

জবাবঃ এটা নির্ভর করছে যারা ইখওয়ানের সাথে জড়িত তাদের নিয়ত ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর।

প্রশ্নঃ সাইয়েদ রমৃদান সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি ইসলামের নামে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে মানুষদের সংগঠিত করছেন।

জবাবঃ আমি এ প্রশ্নের জবাব দান থেকে ক্ষমা চাই।

প্রশ্নঃ আপনাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের পথ কি?

জবাবঃ আমাদের লক্ষ্য ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। মানব রচিত বিধান নয়। এ কারণে লোক তৈরীর জন্যে ইসলামী প্রশিক্ষণের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে।

প্রশ্নঃ আপনাদের সংগঠন কি গোপনে না প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাচ্ছে?

জবাবঃ গোপনে।

প্রশ্নঃ যখন দ্বীনি চরিত্র গঠনই আপনাদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য তাহলে গোপন তৎপরতার হেতু কি?

জবাবঃ প্রকাশ্য তৎপরতা ও প্রশিক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী আছে।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন উম্মতে মুসলিমা দীর্ঘ দিন ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন?

জবাবঃ এ প্রশ্নের জবাব বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে। তবে তারাই উম্মতে মুসলিমার অন্তর্ভুক্ত যারা ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলে।

প্রশ্নঃ বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত বিধানকে কি জাহেলিয়াতী বিধান মনে করেন?

জবাবঃ আমি মনে করি এটা গায়রে ইসলামী বিধান।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন এটা জাহেলী সমাজ ও গায়রে ইসলামী সমাজ?

www.bjilibrary.com

জবাবঃ এখানে জাহেলী সমাজের সংমিশ্রণ রয়েছে।

প্রশ্নঃ আপনার এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মিসরের বর্তমান শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

জবাবঃ আমি এটাকে জাহেলী ব্যবস্থা মনে করি।

প্রশ্নঃ এর অর্থ কি এটা যে, আপনি বর্তমান প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন?

জবাবঃ আমি মনে করি, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ যখন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যাবে তখন পরিবর্তন হবে।

প্রশ্নঃ আপনার মতে তাগুত অর্থ কি?

জবাবঃ আমার মতে তাগুত মানে আল্লাহর শরীয়তের বিপরীত অন্য সকল ব্যবস্থা।

প্রশ্নঃ 'আল হা-কিমাতুলিল্লাহ' সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

জবাবঃ আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তকে জীবন যাপনের বিধান হিসাবে গ্রহণ করা।

প্রশ্নঃ আপনি এটা কিভাবে বুঝলেন?

জবাবঃ ইসলামের উপর অধ্যয়নের ফলে।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন, প্রাচীন যুগে খারেজীরা এ পরিভাষা বলতো।

জবাবঃ ঐতিহাসিক এ তথ্য আমার জানা নেই। এ পরিভাষা যখন তারা ব্যবহার করতো আমি যা বুঝি তা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়তই হবে জীবন বিধান। কেননা, আল্লাহ নিজে হুকুম দেওয়ার জন্যে আসেন না। তিনি শরিয়াত নাযিল করেছেন। যেন তার ভিত্তিতে সকল কিছু পরিচালনা করা হয়। তাই হাকিমাতুলিল্লাহ বলতে বুঝায় আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বাস্তবায়ন। আর এটা কোরআন দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ আপনি কি আপনার এ চিন্তাধারা মাওলানা মওদূদীর সাহিত্য থেকে নকল করেছেন?

জবাবঃ আমি ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করা কালীন মাওলানা মওদূদীর গ্রন্থ এবং অন্যদের গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয়েছি।

www.bjilibrary.com

প্রশ্নঃ মাওলানা মওদূদীর আহবান এবং আপনার আহবানের মধ্যে পার্থক্য কি?

জবাবঃ কোনই পার্থক্য নেই।

প্রশ্নঃ সংগঠনে সামরিক কায়দায় অস্ত্র-প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি?

জবাবঃ শত্রুতা ও বাড়ারাড়ি প্রতিরোধের জন্য, যখন কারো বাড়াবাড়ির সম্মূখীন হতে হয়। আমার দৃষ্টিতে বাড়াবাড়ির ধরণ হচ্ছে কারা নির্যাতন, হত্যা, বিচার পূর্ব নানা ধরনের দমন পীড়ন, যেমন ১৯৫৪সালে করা হয়েছিল।

প্রশ্নঃ এটার দ্বারা বুঝা যায় আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, আপনাদের সংগঠন সালতানাতের মোকাবেলা করার সমকক্ষ?

জবাবঃ যে শক্তিকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তা সরকারের শক্তি হিসাবে পরিগণিত নয়। আর এর বিরোধিতা করা সরকারের বিরোধিতার অর্ন্তভূক্ত নয়।

প্রশ্নঃ আপনি কি জানেন এধরনের সংগঠন করা আইন পরিপন্থী?

জবাবঃ আমি জানি এটা আইন পরিপন্থী। কিন্তু আমি এটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। যদিও এটা প্রচলিত আইন পরিপন্থী, কিন্তু সফলভাবে ইসলামী তরবিয়ত দেওয়ার জন্য এটার বিকল্প ছিল না।

প্রশ্নঃ তরবিয়তের জন্য প্রচলিত আইনের বিরোধিতা কিভাবে করছেন? ইসলামী শরীয়ত কি এটা অনুমোদন করে? অথচ দেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম?

জবাবঃ প্রচলিত আইন একজন মুসলিমকে মুসলিম হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে বাধা প্রদান করে, স্বয়ং প্রচলিত আইনের এটা ত্রুটি ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্নঃ কিভাবে দেখলেন প্রচলিত আইন একজন মুসলিমকে মুসলিম হিসাবে বাধা প্রদান করছে?

জবাবঃ ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রকাশ্য তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ ইখওয়ান দ্বীনি দায়িত্ব পালনেরই চেষ্টা করছে।

প্রশ্নঃ ইখওয়ানুল মুসলিমুন নিষিদ্ধ করার কারণ কি দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্যই?

www.bjilibrary.com

জবাবঃ হ্যাঁ, আমি এ কারণকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ সংগঠন নিষিদ্ধ করার প্রেক্ষাপট কি জানেন?

জবাবঃ আমি জানি সরকারী সিদ্ধান্তেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে সরকার কি কারণে করেছে, তা আমার জানা নেই। আমি বিশ্বাস করি, ইখওয়ানের দ্বীনি তৎপরতার কারণেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, এটি একটি ইসলামী আন্দোলন। ইসলাম বিরোধীদের মোকাবেলায় এটা এক বিপ্লবী শক্তি।

প্রশ্নঃ কিন্তু ইখওয়ান নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার গোপন সংগঠনের ধ্বংসাত্মক তৎপরতার কারণে?

জবাবঃ আমি যা জানি তা হচ্ছে ইখওয়ানের গোপন সংগঠন রয়েছে। আমি এটাও জানি যে সংগঠন নিষিদ্ধের এটা কোন প্রত্যক্ষ কারণ নয়। বরং মূল কারণ হচ্ছে বাহিরের চক্রান্ত। স্বভাবিকভাবে রাষ্ট্র এটা মেনে নিতে পারে না, কিন্তু আপোষে এধরনের গোপন সংগঠন নিষিদ্ধ করা সম্ভব। ইখওয়ানকে প্রকাশ্য তৎপরতার সুযোগ দিলেই হত।

প্রশ্নঃ আপনি কি মনে করেন একমাত্র ইখওয়ানই দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করছে?

জবাবঃ আমি মনে করি ইখওয়ানুল মুসলিমুন অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অধিকতর সফলতার সাথে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত। এর মধ্যে যে সকল ত্রুটি আছে তা আমি নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। কিন্তু ইখওয়ান দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই চূড়ান্তভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্নঃ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেছেন যে, আপনি তাদের বুঝিয়েছেন বর্তমান জাহেলি সমাজের মধ্যে তারাই প্রকৃত মোমেন। তাঁরা দেশ, সমাজ, ও প্রচলিত বিধানের সাথে কোন ধরনের সম্পর্কই রাখছে না। তাঁরা এমন মুসলিম হিসাবে নিজেদের মনে করে যে, তাঁরা রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধাবস্থায়ই রয়েছে। আপনি তাদের কাছে দেশকে অভিহিত করেছেন দারুল হরব হিসাবে। এটা কি ইললামী ইসতেলাহ। আর এরই ভিত্তিতে যে কোন ধরনের হত্যাযজ্ঞকে ক্ষতিকর ও শাস্তিমূলক মনে করা হয় না বরং উল্টো পূণ্যের কাজ বলে মনে করা হয়?

www.bjilibrary.com

জবাবঃ এ ধরনের মনে করা ভুল। মোমেন সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সবার নিকট সুস্পষ্ট। দারুল হরব ও দারুল ইসলামের সাথে উবম্মতে মুসলিমার সম্পর্ক আছে। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য ছিল দার্শনিক দৃষ্টিতে বিধান বর্ণনা করার জন্য, বর্তমান সময়ে একথা চালিয়ে দেয়ার জন্য নয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, তাঁরা আমার কথা ভুল বুঝেছে।

প্রশ্নঃ কিভাবে তারা বুঝার ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে আছে? বিশেষত তাদের একজন-যার নাম আলী ওসমানী স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে, আপনার সাথে মুসলিমদের হত্যার সম্পর্কে আলোচনা করা এই যে, যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলবে তাঁকে হত্যা করা হারাম। এতদ্বসত্ত্বেও আপনি মুসলমানদের হত্যার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন?

জবাবঃ এ ধরনের আলোচনার কথা আমি স্মরণ করতে পারছি না। এটা ঠিক যে, আত্মরক্ষার অধিকার সকলের রয়েছে।

প্রশ্নঃ আপনারা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার সাথে বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধ কি?

জবাবঃ প্রচলিত মানব রচিত বিধানে আল্লাহর শরিয়ত নেই। আমাদের দাবি হচ্ছে আল্লাহর শরিয়তই হবে জীবন বিধান। আমার মতে এটাই প্রধান বিরোধ। একারণেই ছোট খাট আরো অনেক বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ মোহাম্মদ কুতুব কি আপানার এই গোপন সংগঠন সম্পর্কে অবহিত?

জবাবঃ না।

প্রশ্নঃ কেন তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেননি অথচ তিনি তাঁর পুস্তকে আপনার চিন্তাধারাই প্রকাশ করছেন?

জবাবঃ আমি মোহাম্মদ কুতুবের অবস্থা জানি। কোন সংগঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে সে অনাগ্রহী। অপর দিকে আমি চেয়েছিলাম, অন্য কেউ এ সংগঠন সম্পর্কে না জানুক। যদিও সে আমার নিকটজন।

এভাবেই সাইয়েদ কুতুবকে আরো কিছু প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু তিনি সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সাথে সুস্পষ্টভাবে সকল প্রশ্নের জবাব দেন, তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই প্রকাশ করেছেন।

www.bjilibrary.com

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিচার প্রহসন শুরু

১৯৬৫ সালের ২১শে ডিসেম্বর সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়। ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিসরের আইন মন্ত্রী ৪৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তাদের মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন কারাগারে। তিনজন ছিলেন পলাতক। দুইজন ছিলেন মহিলা। একজন জয়নাব আল গাযালী আরেকজন হামিদা কুতুব। বিচার প্রহসন শুরু হল। অভিযুক্তদের কোন কৌশলী নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ নেই। সুদান, মরক্কোসহ কয়েকটি আরব দেশের আইনজীবীরা সেদেশে এসেছিলেন সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সাথীদের মামলা পরিচালনার জন্য। তাদের সবাইকে কায়রো বিমান বন্দর থেকেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফরাসী বার এসোসিয়েশান সভাপতি উইলিয়াম থরপ মামলার কাজে কায়রো আসার অনুমতি পাননি। লন্ডন ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা আইনজীবী পাঠাতে অনুমতি পায়নি। পর্যবেক্ষক পাঠাতে চেয়েও সফল হয়নি। বিচার কক্ষে কোন সাংবাদিক, বিদেশী নাগরিক, জনপ্রতিনিধি এমনকি সাধারণ মানুষকেও ঢুকতে দেয়া হয়নি। টেলিভিশনে এই বিচার অনুষ্ঠান দেখানোর কথা থাকলেও অভিযুক্তরা অভিযোগ অস্বীকার করে কারা নির্যাতনের বর্ণনা দিতে শুরু করলে সম্প্রচারের সিদ্ধান্তই বাতিল করা হয়। সাইয়েদ কিছু বলতে চাইলেও তাঁকে কিছু বলতে দেয়া হল না। এমনি অবস্থায় ১৮ই মে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আদালতে বিচার প্রহসন নাটক মঞ্চস্থ হয়।

রায়ের অপেক্ষায় সাইয়েদ কুতুব

১৮ই মে ১৯৬৬ জেরা সমাপ্ত হয়। চার মাস অতিবাহিত হল। সাইয়েদ রায়ের অপেক্ষা করছেন। রায় কি হবে তা আগেই জানা। তাই মৃত্যুদণ্ডের প্রহর গুণছেন। এ সময় আহমদ রায়েফের সাথে জেলখানায় তাঁর দেখা হয়। তিনি জানতে চাইলেন, 'আপনি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন?' সাইয়েদ কুতুব প্রসন্ন চিত্তে বললেন, 'আমি আমার রবের সাথে মিলিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

www.bjilibrary.com

সাইয়েদের পক্ষে চিঠি ঃ সাবেক মন্ত্রী কারাগারে

কামাল উদ্দিন হুসাইন মিসরের সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী। সাইয়েদকে তিনি ভাল জানতেন। তাই তিনি মিসরের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রতি,

আস সাইয়েদ জামাল আব্দুন নাসের, প্রেসিডেন্ট, মিসর প্রজাতন্ত্র।

জনাব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আমি যদি আপনাকে এ কথা না বলি তাহলে আমার কল্যাণ হবে না। আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেন। তার গুনাহ মাফ করে দেন। তাকে বড় প্রতিদান দান করেন। আল্লাহ তার নবীকে বলেছেন 'হে নবী আপনি আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের ও মোনাফেকদের অনুসরন করবেন না। আল্লাহর রাসূল তাঁর সঙ্গী সাথীদের ও মোমেনদের এ নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলমানগণ তাঁদের খলীফা এবং নেতৃবৃন্দকেও পরস্পর পরস্পরকে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলেছেন। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি। তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। তোমরা মারুফ কাজের আদেশ দেবে। মুনকার কাজের নিষেধ করবে।

ওয়াসসালাম।

কামাল

আব্দুন নাসেরর কাছে তার সাবেক সহযোগীর এ চিঠি পৌছল। এ চিঠিতে কি বলতে চেয়েছেন তার সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, তা বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু নাসের আল্লাহকে ভয় করলেন না। বরং সাবেক শিক্ষামন্ত্রীকে কারাবন্দী করলেন।

কারাগার থেকে সাইয়েদের শেষ চিঠি

সাইয়েদ কুতুব কারাগারে খুবই আনন্দিত। রায় ঘোষণা না হলেও নিশ্চিত মৃত্যুদন্ডের আনন্দে আনন্দিত। তিনি কারাগারে বসে সাহিত্যিক বন্ধুকে চিঠি লেখেনঃ

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভাই আহমদ,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে তুমি আমার বিশ্বাস ও চিন্তার সাথে একমত। আমি কারাগারে আল্লাহকে এমনভাবে পেয়েছি তার আগে কখনও এভাবে পাইনি। আল্লাহর বিধানের সাথে যেভাবে পরিচিত হয়েছি অতীতে এভাবে পরিচিত হতে পারিনি। আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট যে আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তত্বাবধান করছেন। মোমেনদের সাথে তার কৃত ওয়াদা পূরণের ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। ইতিপূর্বে এই ধরনের মানসিক প্রশান্তি আমার ছিল না। আমি জানি আমার মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। আল্লাহ যা ভালো মনে করেন তাই করবেন। কোন কিছু করার ব্যাপারে তিনি একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারে না।

সাইয়েদ কুতুব একজন কারা প্রহরীর মাধ্যমে ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে এ চিঠি পাঠানো হয়। সাইয়েদের ঈমানী চেতনা কত বেশী ছিল এ চিঠির মাধ্যমে তা ফুটে ওঠে।

রায় ঘোষণা ঃ মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রদান

বিচারক রায় ঘোষণার আগে আব্দুন নাসেরের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করে ১৯৬৬ সালের ২১শে আগষ্ট রায় ঘোষণা করেন। অভিযুক্ত ৪৩ জন নেতা কর্মীর মধ্যে সাত জনকে মৃত্যু দন্ড দেয়া হয়। তাঁরা হচ্ছেন, সাইয়েদ কুতুব, মোহাম্মদ ইউসুফ, আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাঈল, শবরী আরাফাহ, আহমদ আব্দুল মজিদ, আব্দুল আজিজ, আলী উসমাভী। ২৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। ১১ জনকে দশ থেকে পনের বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্তদের মাঝে আলী উসমাভী বিদেশী নাগরিক। কিছুদিন পর তাকে মুক্তি দিয়ে আমেরিকা যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়। আহমদ আব্দুল মজীদ, আব্দুল আজিজ ও শরবী আরাফাহ এর মৃত্যুদন্ড হালকা করে

www.bjilibrary.com

যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়। সাইয়েদ কুতুবসহ মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে রায় ঘোষাণাকালে বিচারক বলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক তোমরা সবাই মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছ। তোমরা এ দেশের ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতাচ্যুত করতে চেয়েছ। তাই তোমাদের ফাঁসীর আদেশ দেয়া হলো।'

মৃত্যুদন্ডাদেশ শুনে সাইয়েদের প্রতিক্রিয়া

বিচারক সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদন্ডাদেশ ঘোষণা করার পর আদালতের নথিপত্র যারা লিখছেন তাঁরা কাঁদছে। অথচ সাইয়েদ রায় শোনার পর খুশী মনে বলে উঠলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ'। সে দিন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার কাছে এটা কোন বিষয়ই নয় যে, আমি কোথায় মরতে যাচ্ছি এবং কিভাবে জালেমরা আমার মৃত্যুদন্ড দেবে। আমি তো এতেই সন্তুষ্ট যে, আমি আল্লাহর একজন অনুগত বান্দা হিসাবে শাহাদাতের পেয়ালা পান করতে যাচ্ছি।'

জয়নাব আল গাযালী লেখেন, মৃত্যু দন্ডাদেশ দেয়ার পাঁচ দিন পর সাইয়েদ কুতুব কারাগারে আটক ছোট বোন হামিদা কুতুবকে দেখতে তার কক্ষে যান। সাথে কারা প্রহরী ইবরাহীম ছিল। কিছুক্ষণ পর ইবরাহীম চলে আসে। তখন ছোট বোন তাঁকে দেখে বললেন, 'ধন্যবাদ, প্রিয়ভাই সাইয়েদ। এটা আমার জন্য এক দুর্লভ মুহূর্ত। আপনি আমার পাশে একটু বসুন।' সাইয়েদ পাশে বসলেন। বিভিন্ন বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো। তিনি সবার ধৈর্য্য ধারণের নির্দেশ দিলেন। হামিদা কুতুব মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ভাইকে দেখে বিষণ্ন। সাইয়েদ তার ছোট বোনকে আদর করলেন এবং এমন কিছু কথা বললেন যার পরিপ্রেক্ষিতে হামিদা কুতুবের বিষণ্ন মনেও হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

মৃত্যুদন্ডাদেশ মওকুফ করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অনুরোধ

সাইয়েদের মৃত্যুদন্ডাদেশ শোনার পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ হতবাক হল। বিচারের নামে অবিচার দেখে মানবতা আর্তনাদ করে উঠলো। মৃত্যুদন্ডাদেশের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ঝড় উঠলো।

www.bjilibrary.com

বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মৃত্যুদন্ডাদেশ রহিত করার জন্য মিসর সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়। বাদশাহ ফয়সল বিন আব্দুল আজীজ তার একজন মন্ত্রীর মাধ্যমে জামাল আব্দুন নাসেরের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নাসেরের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন। সেখানে আনোয়ার সাদাতও ছিলেন। নাসের মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাতে কি?' মন্ত্রী জবাব দিলেন, 'বাদশাহ ফয়সলের বার্তা।' নাসের জানতে চাইলেন, 'কি সম্পর্কে?' মন্ত্রী জবাব দিলেন, 'সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের মৃত্যুদন্ডাদেশ রহিত করার জন্য।' এ কথা শোনার পর নাসের ক্রোধান্বিত হন এবং বাদশাহ ফয়সলের বিশেষ দূতকে শুনিয়ে নির্দেশ দিলেন আগামীকাল খুব সকালে সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার।

সাইয়েদের সাথে হামিদা কুতুবের শেষ সাক্ষাত

মৃত্যুদন্ডাদেশ দেয়ার পরও সাইয়েদকে বশে আনার জন্য সরকার নানা প্রলোভন দেয়। মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকরী করার পূর্ব রাত। একজন কারা প্রহরী হামিদা কুতুবের রুমে এসে জানায় আপনাকে কারা তত্বাবধায়ক হামজা বসুনী তার অফিসে দেখা করতে বলেছেন। হামিদা কুতুব বলেন, আমি তার কক্ষে যাওয়ার পর আমাকে আমার বড় ভায়ের মৃত্যুদন্ডাদেশ দেখানো হয়। অতপর কারাতত্বাবধায়ক বলেন, আমার ভাই যদি তাদের ইচ্ছামত সব কিছু করতে সম্মত হয় তাহলে মিসর সরকার মৃত্যুদন্ডাদেশ হালকা করতে প্রস্তুত আছে। কারাতত্বাধায়ক আমাকে আরও বলেন, আমরা জানি আপনি ছাড়া আপনার ভাইকে বুঝাবার অধিক উত্তম ব্যক্তি আর কেউ নেই। আপনার ভায়ের কয়েকটি কথা তাকে মৃত্যুদন্ড থেকে মুক্তি দিতে পারে। আমি মনে করি আপনি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন। আমি এও বিশ্বাস করি যে, আপনারা মিসরের খুবই ভাল মানুষ। আপনারা

www.bjilibrary.com

শুধু আপনাদের বিশ্বাসের বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন। আমরা চাই সাইয়েদ মৃত্যুদন্ড থেকে বাঁচুক। এ কথা বলে কারাতত্ত্বাবধায়ক সাফাত রুবীকে বললেন, হামিদাকে তার ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাও। তারপর আমি আমার সহোদর বড় ভাই সাইয়েদ কুতুবের নিকট এলাম। তাঁকে সালাম করলাম এবং তাদের বক্তব্য পৌঁছালাম। তিনি আমার দিকে গভীরভাবে তাকালেন তারপর বললেন, তুমি যা বললে, তাকি তুমি চাচ্ছ, না তারা চাচ্ছে? আমি ইশারায় বুঝাতে চেষ্টা করেছি তারা চাচ্ছে। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি এ কথা বলা সঠিক হতো তাহলে আমি বলতাম। দুনিয়ার কোন শক্তি আমাকে একথা বলা থেকে ফেরাতে পারত না। কিন্তু তারা যা বলছে আমি তা করব না। আমি কখনই মিথ্যা বলব না।'

অতপর সাফাত জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আপনার সিদ্ধান্তের উপর অটল? সাইয়েদ বললেন, হ্যাঁ। এরপর সাফাত আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তারপর আমি ভাইয়াকে পুরো ঘটনা বললাম। ভাইয়া আমাকে প্রশ্ন করলেন, তাদের কথায় তুমি কি সন্তুষ্ট? আমি বললাম, না। তারপর ভাইয়া আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'জীবন মৃত্যু আল্লাহর হাতে। হায়াত বৃদ্ধি কিংবা কমানোর ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। তারা কারো ক্ষতি কিংবা উপকারের ক্ষমতা রাখে না।' ইতিপূর্বেও অনুরূপ প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। একবার সাইয়েদকে প্রশ্ন করা হয় আপনি কেন সুন্দরভাবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন? একটু ঘুরিয়ে তাদের কথা স্বীকার করলে মৃত্যুদন্ডাদেশ থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। সাইয়েদ জবাব দেন। আকীদাগত বিষয়ে তাওরিয়া জায়েজ নেই। কোন আদর্শবাদী সংগঠনের নেতার জন্য রুখসাতের পথ অবলম্বন করা উচিত নয়। আমি পনের বছর শাহাদাত লাভের জন্য কাজ করছি। আল্লাহর প্রশংসা,

www.bjilibrary.com

মৃত্যুদন্ডাদেশ সে সুযোগ এনে দিয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের সাথে হামিদা কুতুবের এটাই ছিল শেষ সাক্ষাত। সাইয়েদ আদরের বোনকে শেষবারের মত দেখে নিলেন। ছোট বোন অশ্রু সজল নয়নে সালাম দিয়ে শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। বিদায়কালে হামিদাকে বললেন, আমার পক্ষ থেকে মুর্শেদে আম হাসান হুদাইবীকে সালাম পৌছাবে।

সাইয়েদ কুতুবের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর

২৮শে আগষ্ট রাতে সাইয়েদ কুতুব, তাঁর সঙ্গী মোহাম্মদ হায়াশ ও আব্দুল ফাতাহ্ ইসমাঈলকে ফাঁসীর সেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কারাগারের চারিদিকে সশস্ত্র সৈন্য মোতায়েন করা হয়। তারা টহল দিচ্ছে। ২৯শে আগষ্ট ভোররাত। সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর দুসঙ্গীকে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফাঁসী দেয়ার সকল আয়োজন সম্পন্ন। সাইয়েদ কুতুব ফাঁসীর মঞ্চে যাচ্ছেন। তিনি আনন্দিত। তৃপ্তিতে হাসছেন। নির্ভীকচিত্তে পা বাড়াচ্ছেন। সোবহে সাদিকের সময়। চারিদিকে ফজরের আযান ধ্বনিত হচ্ছে। সাইয়েদ কুতুব হাঁসতে হাঁসতে ফাঁসীর মঞ্চে বসলেন।

সাইয়েদ কুতুব ও তাঁর সঙ্গীদের ফাঁসী কার্যকর হলো। কার্যকর করার সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে মিসরের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা উল্লাস প্রকাশ করে। তারা প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করতে যায়। কিন্তু মিসরের বিভিন্ন কারাগারের কারাবন্দীরা বুক ফাটা আর্তনাদ করে। তাঁদের কান্নায় সিক্ত হয় কারাগার। বাদশাহ ফয়সল মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করার খবর শোনার পর পড়লেন, 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।' তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। সারা বিশ্বের অগণিত মানুষ কাঁদলো। বিশ্বের সর্বত্রই শোকের ছায়া। সাইয়েদ কুতুব নেই। তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্ম বিশ্বের অগণিত মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে রইল।

www.bjilibrary.com

একনজরে সাইয়েদ কুতুবের রচনাবলী

সাইয়েদ কুতুব ইসলামী আন্দোলনের একজন নেতা। একজন সুসাহিত্যিক ও পন্ডিত। তিনি তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন শিশু সাহিত্য দিয়ে। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ ও ইসলামী মূল্যবোধ শিশুদের উপযোগী করে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। নবীদের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে লেখেন। তিনি শিশুদের জন্য জীবন চরিত, দেশাত্মবোধক গান, ইসলামী গান রচনা করেন। কোরআন চর্চা শুরু করার পর কোরআনের আলোকেই সাহিত্য চর্চা করেন, তাফসীর লেখেন। ইসলামী জীবন দর্শনের উপর লেখেন।

তাঁর সাহিত্য কর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. বিভিন্ন পত্রিকা ও সাময়িকীতে লিখিত প্রবন্ধাবলী।

তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতেন। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ৪৫৫টি। এসকল প্রবন্ধাবলী পরবর্তী সময়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দুই. প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ২৬। পঁচিশটি জীবদ্দশায় ছাপা হয়। একটি তাঁর শাহাদাতের বিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। তাঁর সবচেয়ে মূল্যবান অবদান হচ্ছে তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন।

তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলী আবার দুভাগে বিভক্ত।

ক. সাহিত্য সমালোচনামূলক। এধরনের গ্রন্থের সংখ্যা তের।

খ. ইসলামের জীবন দর্শন কেন্দ্রীক। এধরনের গ্রন্থের সংখ্যাও তের।

সাইয়েদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে

১. মুহীম্মুশ শায়ের ফীলহায়াত ওয়াশশে'র লিজায়লিল হাজের (জীবনে কবির আসল কাজ ও আধুনিক বংশধরদের কবিতা) এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২. আসসাতী ওয়াল মাঝহুল (কবিতা গুচ্ছ ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়।

www.bjilibrary.com

৩. নকদু কিতাবে মুস্তাকবিলিস সাকাফাহ ফি মিসর (মিসরের ভবিষ্যত সংস্কৃতি নামক পুস্তকের সমালোচনা) ১৯৩৮ সালে লিখিত ডঃ তোহা হুসাইনের মিসরের ভবিষ্যত সংস্কৃতি নামক বইয়ের সমালোচনায় এ বইটি লেখেন।

৪. আততাসবীরুল ফান্নী ফীল কুরআন (কুরআনের শিল্পগত ছবি) এটিই প্রথম ইসলামী সাহিত্য। ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়।

৫. আলআতইয়াফুল আরবা (চার ভাইবোনের চিন্তাধারা)। এতে চার ভাই বোনের চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন সুন্দরভাবে অংকিত হয়েছে। বইটি ১৯৪৫ সালে প্রকশিত হয়।

৬. তিফলে মিনাল কারিয়াহ (গ্রামের ছেলে)। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৭. মাদীনাতুল মাসহুর (যাদুনগরী) আসহাবে কাহফ ও আলফে লায়লার ঘটনা সামনে রেখে এটি লিখিত। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৮. কিতাবুন ওয়া শাখছিয়াতুন (গ্রন্থ ও ব্যাক্তিত্ব) এটিও ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত হয়।

৯.আশওয়াক। ব্যাক্তিগত জীবনের কিছু কথা এ বইতে তুলে ধরা হয়েছে। এটি ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়

১০. মোশাহেদুল কেয়ামাহ ফীল কুরআন (কুরআনের আঁকা কেয়ামতের দৃশ্য) এ বইতে কুরআনে বর্ণিত জান্নাত, জাহান্নাম, কেয়মাত, হাশর প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ১৯৪৭ সালে বইটি প্রকাশিত হয়।

১১. রওজাতুত তেফলে (শিশুপার্ক)। এটি শিশুদের জন্য লেখা বিভিন্ন গল্পের সমষ্টি। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

১২. আল কাসাসুদ্দীনী লিল আতফাল (শিশুদের দ্বীনি গল্প) এতে নবীদের ঘটনা তুলে ধরা হয়। ১৯৪৮ সালে কায়রোর মাকতাবাদে সাদ এটি প্রকাশ করে।

১৩. আল যাদিদ ফিল লুগাতিল আরাবিয়াহ।

১৪. আল যাদিদ ফিল মাহফুজা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে থাকার সময় বইটি লেখেন। গ্রন্থটি মিসরের পাঠ্যসুচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

www.bjilibrary.com

১৫. আননাকদুল আদাব উসুলুহু ওয়া মানাহেজুহু (সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি) ১৯৪৮ সালের জুন মাসে এটি প্রকাশিত হয়।

১৬. আল আদালাতুল ইজতেমায়ীয়াতু ফিল ইসলাম (ইসলামে সামাজিক সুবিচার) ১৯৪৮ সালে আমেরিকা যাবার আগে এ বইটি লেখেন। ১৯৪৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

১৭. তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন।

১৮. মারেকাতুল ইসলাম ওয়ার রাসমালিয়াহ (ইসলাম ও পুঁজিবাদের দন্দ্ব, ১৯৫১ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

১৯. আসসালামুল আলামী ওয়াল ইসলাম (ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি) ১৯৫১ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়।

২০. দেরাসাতুল ইসলামিয়া (ইসলামী রচনাবলী) এটি ৩৫ টি প্রবন্ধের সমষ্টি। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়।

২১. হাজাদদ্বীন। ১৯৬০ সালে কারাগারে থাকাকালীন লেখেন। এতে কারাগারের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

২২. আল মুস্তাকবিল লি হাযাদ দ্বীন। মানব রচিত আদর্শের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনের জীবন ব্যবস্থা হবে ইসলাম। গ্রন্থটিতে এ কথাই তুলে ধরেছেন।

২৩. খাসায়েসু তাসাব্বুরিল ইসলাম। এ বইতে সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন ও জগত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরেছেন। এটি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

২৪. আল ইসলাম ওয়া মোশকেলাতুল হাজারাহ (ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার সংকট) ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

২৫. মায়ালেম ফিততারিক। এটি সর্বশেষ গ্রন্থ। ইংরেজীতে Milestone, বাংলায় ইসলামী বিপ্লবের ধারা নামে অনুদিত হয়েছে।

২৬. মুকাওয়ামাতুত তাসাব্বুরিল ইসলামী। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়।

www.bjilibrary.com

তিন. অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী

সাইয়েদ কুতুবের অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তাঁর কারাবরণের পর হারিয়ে যায়। অনেকটি অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠী নষ্ট করে দেয়। এ ধরনের সাহিত্য ও প্রবন্ধের সংখ্যাও অনেক।

যেমন মুহিম্মাতুশ শায়ের ফিল হায়াত, দেরাসাতুল আশওয়াক, কাফেলাতুর রাকিক, হেলমুল ফজর, আল কেসসাতু ফীল আদাবিল আরাবিয়াহ, আল কিসসাতুল হাদীস, আমেরিকা আললাতি রাআইতু, হাজাল কুরআন প্রভৃতি।

তাঁর শাহাদাতের পর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে সংকলন করে আরও কিছু গ্রন্থ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ করেছে। যেমন আমেরিকা থাকার সময়ে বন্ধু বান্ধব ভাই বোনদের কাছে লিখিত চিঠি 'আফরাহুর রুহ' নামে প্রকাশিত হয়। নাহবু মুজতা মেয়ুল ইসলামী, মা'রেকাতুনা মায়াল ইয়াহুদ, তাফসীরে আয়াতের রেবা, আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর শাহাদাতের পর প্রকাশিত হয়।

সাইয়েদ কুতুব মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্ক। তিনি শুধু ইসলামী আন্দোলনের নেতা ছিলেন না। তিনি হাফিজে কুরআন, লেখক, প্রখর দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন আলেম, কবি ও সুসাহিত্যিক হিসাবে সাফল্য অর্জন করেন। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তিনি নজীর বিহীন প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

• • •

www.bjilibrary.com

উত্‌লু প্রকাশনের প্রকাশিত বইসমূহ

১.তথ্য সন্ত্রাস-সালেহউদ্দীন আহমদ জহুরী-৭০.০০

২.অপসংস্কৃতির বিভীষিকা (১ম খণ্ড) ঐ -৮০.০০

৩.সাইয়েদ কুতুব শহীদ-আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ-১৫.০০

পরিবেশনায়

তাসনিয়া বই বিতান

৪৯১/১ ওয়্যারলেস রেলগেট,এলিফ্যান্ট রোড

বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭